OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 120 - 128
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 120 - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ (চতুর্থ পর্ব) : বৈষ্ণবীয় পরিবেশে কমললতার উপাখ্যান

নূপুর অধিকারী বাগ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, উদয়নারায়নপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয়, হাওড়া
গবেষক, সিকম্ স্কিলস ইউনিভার্সিটি
Email ID: nupuradhikari2017@gmail.com
0009-0000-0630-1128
ও
ড. মধুছন্দা চৌধুরী ওঝা
পি. এইচডি সুপারভাইজার, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Vaishnavism affiliation, SaratChandra, ‘Srikanta’ Kamallata, Vaishnavite music, View of life, Muraripur Akhra, Literary expression of personal life.

Abstract
In the first half of the twentieth century, SaratChandra Chattopadhyay was a popular figure in the realm of Bengali literature, particularly known for his prose fiction. Sarat Chandra’s novels and the Vaishnavite tradition are two completely different literary ideas and are much debated topics in Bengali literatur. But with the combination of these two ideas, Saratchandra's biographical art forms can be the subject of a completely unique discussion. SaratChandra’s personal life was filled with mystery and immense diversity. Often labeled a ‘wanderer’ due to his unsettled lifestyle, he transformed all the experiences and emotions he absorbed from society and life into the artistic fabric of his novels. From this foundation emerges a thematic engagement with literary elements such as the traditional Vaishnavite motifs of Bengal’s culture. In his personal life, Sarat Chandra was deeply devoted to Vaishnavism and its philosophy. His novel ‘Srikanta’ (in its entirety) presents a continuous narrative tracing Sarat Chandra’s journey from childhood to adulthood. Among its sections, the ‘Fourth Part’, composed on the basis of Vaishnavite aesthetic theory, is considered the most exemplary. This study aims to explore and discuss how Sarat Chandra’s Vaishnavism philosophy influenced the creation of the character Kamallata. In the novel Srikanta, the Vaishnavite setting is primarily centered around the akhara (monastic community) of Muraripur. The construction of this setting is deeply rooted in Sarat Chandra’s personal engagement with Vaishnavism. Much of his childhood was spent at the Vaishnavite akhara of Raghunath Goswami. Critics have noted that this very akhara in real life was transformed into the Muraripur akhara in the fourth part of ‘Srikanta’. Throughout the akhara, there is a vivid depiction of the devotion and concentration of the Vaishnavi women in their spiritual

practices. The supreme Vaishnavi, Kamallata, immersed in the service of God, embodies the melodies of Vaishnavite songs and the enchanting tunes of Lord Krishna's flute. In his personal life, Sarat Chandra was predominantly a practitioner of Vaishnavite music. His profound reverence for Vaishnavite songs inspired the creation of characters like Kamallata. Through Kamallata, the Vaishnavite musical devotion of Sarat Chandra finds its fullest expression.

Discussion

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের অনুসন্ধান সূত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। অখণ্ড 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সর্বশেষ পর্ব 'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব' নামে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের আধারে রচিত এই পর্বটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অব্যবহিত পরেই বাঙালির স্মৃতিপটে স্মরণীয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিশ শতকের প্রথম-অর্ধ, বাংলা সাহিত্যের শরৎ-যুগ হিসেবে ধরা হয়। বাংলা সাহিত্য-জগতের এক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে তিনি খুব সহজেই বাঙালির প্রিয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন। তবে বাঙালি পাঠক সমাজে তাঁর আবির্ভাব ছিল বেশ সচকিত। কারণ রবীন্দ্রময় বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় বাঙালী পাঠক যখন প্রায় রবীন্দ্রাবিষ্ট হয়ে আছেন, তখন আকস্মিকভাবেই 'কুন্তলীন' পুরস্কার বিজয়ী 'মন্দির' (১৯০৩) গল্পের মাধ্যমে, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব পাঠককে চকিত ও বিস্মিত করে তোলে। সারস্বত সমাজে উচ্চ-প্রশংসিত এই ছোটগল্পটি, লেখক তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনামে লিখেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' (১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ)। ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের জীবন বেশ রহস্যময়তা ও সীমাহীন বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তিনি তাঁর ছন্নছাড়া জীবনের ভবঘুরে চরিত্র নিয়ে যখন যেখানে হাজির হয়েছেন, সেখানকার সমাজ ও জীবনের অভিজ্ঞতাকেই জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। আর সেই সূত্র ধরেই উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্যে উঠে এসেছে বঙ্গ-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের মতো সাহিত্যিক উপাদানের প্রভাবগত উপস্থাপনা। 'বড়দিদি' (১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ), 'পন্ডিতমশাই' (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ), 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব - ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ, ২য় পর্ব - ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ, ৩য় পর্ব - ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ, ৪র্থ পর্ব - ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ), 'নববিধান' - (১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) প্রভৃতি উপন্যাসে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই তিনি বৈষ্ণবীয় চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন।

অনেক সাহিত্য-সমালোচকদের মতে 'শ্রীকান্ত'-ই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা, যা তাঁর সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য এনে দেয়। আত্মজীবনী ও সাহিত্যগুণ - এই দুইয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণে শ্রীকান্তের শৈশব থেকে পরিণত জীবন পর্যন্ত এক ধারাবাহিক যাত্রার কাহিনি হল এই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস। চারটি খন্ডে রচিত এই উপন্যাস লেখকের আত্মিক ও মানবিক ভ্রমণের গল্প, যেখানে শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনদর্শনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনিতে ধারাবাহিকতা থাকলেও এই চারটি খন্ড তিনি একসাথে রচনা ও প্রকাশ করেননি। ১৩২২ সালের মাঘ মাস থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এই উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' নামে। প্রথম দুটি সংখ্যায় লেখকের নাম হিসেবে ছিল 'শ্রীকান্ত শর্মা'। তৃতীয় সংখ্যা থেকে লেখক নিজের নামটি প্রকাশ করেন। মোট তেরোটি সংখ্যা নিয়ে শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্ব বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। পরের বছর ১৯১৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৃতীয় খন্ডের জন্য ঔপন্যাসিক কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করে, বহু বছর কাজ অসমাপ্ত রাখলেন, কারন এই সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন, অবশেষে সংখ্যা প্রকাশের ধারাবাহিকতা ভেঙে ১৯২৭ সালের ১৮ই এপ্রিল মোট ১৫টি পরিচ্ছেদে উপন্যাসের তৃতীয় খন্ড প্রকাশ করলেন। প্রথম তিনটি পর্ব 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' নামে ছাপা হলেও চতুর্থ খন্ড ছাপা হয়েছিল 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব' নামে। শুধু নাম নয় - পত্রিকাও পরিবর্তিত হয়েছিল। চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'য় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে, কমললতা চরিত্র-সৃজনে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তার অনুসন্ধান ও আলোচনাই এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য। আমরা আগেই জেনেছি, শরৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তুগত একটি বিশেষত্ব হলো বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ। এই বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপট নির্মাণের মূলে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও বৈষ্ণবীয় চর্চার ইতিহাস।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 120 - 128
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপট নির্মাণের মূলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বৈষ্ণবীয় চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় - তাদের বংশে আট পুরুষ ধরে একজন করে সন্ন্যাসী হয়ে আসছেন। ভুবনমোহিনী দেবীর চতুর্থ পুত্র প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের রেঙ্গুন আশ্রমে সন্ন্যাসী হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণকারী প্রভাসচন্দ্রের নাম হয়েছিল স্বামী বেদানন্দ। এক সময় শরৎচন্দ্র দিলীপ কুমার রায়কে পত্র মাধ্যমে জানান—

> "এই বংশে আমার মেজ ভাই (প্রভাস) স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া চললো।"[১]

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর। বাড়ির কাছেই দেবানন্দপুর দিয়ে বয়ে গেছে সরস্বতী নদী। খেয়াঘাটের ডোঙা বেয়ে তিন-চার মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়ায় তিনি প্রায়ই ছেলেবেলায় যেতেন এবং বৈষ্ণবদের সাথে সময় কাটাতেন। কারণ—

> "কৃষ্ণপুরের এই বৈষ্ণবদের আখড়া বাটিটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই পায়ে হেঁটেও এই আখড়ায় যেতেন।"[২]

আর এই আখড়াই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে মুরারিপুরের আখড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। সন্ন্যাস জীবন হল সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে আত্মত্যাগের জীবন, যা বৈষ্ণবীয় ত্যাগ ধর্মের ইঙ্গিতবাহী। প্রসঙ্গত, শরৎচন্দ্র নিজেও একবার পিতা মতিলালের সঙ্গে ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। এই সময় তিনি নাগা সন্ন্যাসীর দলেও ভিড়েছিলেন। সন্ন্যাসী বেশে ঘুরতে ঘুরতে মজঃফরপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে এক ধর্মশালায় থাকতেন এবং রাতে ধর্মশালার ছাদে উঠে গান গাইতেন যা শুনে পথের লোক মুগ্ধ হয়ে যেত।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রধানত বৈষ্ণব সংগীতেরই সাধক ছিলেন। ভক্তিমূলক বৈষ্ণব পদ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কারণে শরৎ সাহিত্যের বহু নর-নারী চরিত্র বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। যেমন বৃন্দাবন, বৃন্দাবনের মাতা, কুঞ্জের শাশুড়ি মাতা, নীলাম্বর, কুসুম সর্বোপরি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বের ব্রজানন্দ সন্ন্যাসী, সুনন্দা, চতুর্থ পর্বের গহর, কমললতা।

> "শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব-সঙ্গীতপ্রীতি আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইল 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে। মুরারিপুরের আখড়ায় কমললতার কণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত ভক্তিভাবোচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিয়েছেন।"[৩]

জানা যায়, রেঙ্গুনে বসবাস কালে পল্লীর মিস্ত্রিমজুরদের নিয়ে শরৎচন্দ্রের একটি হরিনামের দলও ছিল। নিজের বাড়িতেই তিনি মাঝে মাঝে কীর্তন করতেন। শরৎচন্দ্রের কীর্তন গানের তুলনা হয় না, কণ্ঠস্বরও ছিল খুব মিষ্টি। তাই বৈষ্ণব সঙ্গীতের মাধুর্য ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাব তাঁর গানে মূর্ত হয়ে উঠতো। দোল, চাঁচর ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার মতো উৎসব শরৎবাবুর কাছে কিছুই বাদ যেত না। যোগেন্দ্রনাথ সরকার একবার শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে জ্ঞানদাসের সেই বিখ্যাত পদ— 'তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারই রূপে' শুনে মন্তব্য করেছিলেন—

> "বাংলা গানে যদি প্রাণ থাকে তো এইসব মহাজনদিগের পদেই আছে, আবার বাঙ্গালীর প্রাণেও যদি সত্যকার গান থাকে তো সেও এই বৈষ্ণবগানেই।"[৪]

একবার রেঙ্গুনের অফিসে গানের অনুরোধে গাইলেন—

> "শ্রীমুখপঙ্কজ - দেখবো বলে হে/ তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।"[৫]

বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্বের প্রতি ব্যক্তিগত ভালোলাগা ও আকর্ষণকে পটভূমি করেই তিনি রচনা করলেন 'শ্রীকান্তে'র মতো কালজয়ী উপন্যাস। যেখানে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের প্রতিফলন বেশ স্পষ্ট হয়ে আছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে, উপন্যাসের কাহিনিকে গতিদান করে সম্পূর্ণতা দিয়েছে কমললতা চরিত্রটি। উপন্যাসে কমললতা মুরারিপুরের আখড়ার একজন যুবতী বৈষ্ণবী। কমললতা নামের সাথে পাঠকদের প্রথম পরিচয় উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে, নবীনের মাধ্যমে। নবীন অবশ্য 'কমললতা' বলেনি, বলেছে 'কমলিলতা'। এই নবীন, শ্রীকান্তের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 120 - 128
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাঠশালার বন্ধু গহরের বাবার আমলের লোক। তাদের গরু বাছুর চাষবাস দেখে, বাড়ি আগলায়। কমললতা সম্পর্কে শ্রীকান্তকে নবীন জানায়—

> "কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী।-এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়।"[৬]

নবীনের কথার ইঙ্গিত অনুসারে গহর হয়তো মুগ্ধ হয়েই বৈষ্ণব সেবায় মাঝে মাঝেই টাকা পয়সা খরচ করে আবার বহু পুরনো এই আখড়ার প্রাচীর ভেঙে গেলে নবীন নিজ খরচায় গোপনে তা মেরামত করে দেয়। বৈষ্ণবী কমললতাকে উপন্যাসে প্রথম দেখা গেল শ্রীকান্তের চোখ দিয়ে—

> "বয়স ত্রিশের এর বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি - হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসির মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসির জপমালা।"[৭]

বৈষ্ণবীর চোখ মুখের ভাব এবং চলার ধরন শ্রীকান্তের কাছে আশ্চর্য রকমের পরিচিত ঠেকেছিল। শ্রীকান্তের এই মনে হওয়াটা পাঠকমনে ঔৎসুক্য আনলেও তার নিরসন ঘটে কমললতার তামাশার মধ্য দিয়ে। কমললতা জানান—

> "দেখেচ বৃন্দাবনে ... অনেক কালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে - সব ভুলে গেলে?"[৮]

কমললতার এই ঠাট্টা আমাদের নিয়ে যায় রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গোষ্ঠলীলায়। যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সাথে (যেমন শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গল) গরু চরাতেন, খেলা করতেন, একসাথে খাবার খেতেন, ফল পেড়ে খেতেন, বনফুলের মালা গেঁথে সখাদের গলায় পরিয়ে দিতেন। এভাবেই তিনি সখ্যপ্রেম প্রকাশ করতেন। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোনো এক শিষ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুরারিপুরের এই আখড়ায় বৈষ্ণবী কমললতার সাথে শ্রীকান্তের প্রথম পরিচয়ের সূত্রধরে আমরা এক স্নিগ্ধ-শান্ত-সমাহিত বৈষ্ণবীয় পরিবেশের সান্নিধ্যে আসি।

এরপর শ্রীকান্তের দৃষ্টি দিয়ে মুরারিপুরের আখড়া-কেন্দ্রিক বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের যে প্রাত্যহিক জীবনচর্যা উঠে আসে, তাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পাঠকের মনে এক প্রীতিপূর্ণ মনোভাব জন্মায়। কমলের সাথে আখড়ার ভিতরে গিয়ে শ্রীকান্ত দেখলেন—

> "সেথায় কমলের বনই বটে। ... বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার এবং নানা কাজে ব্যাপৃত।"[৯]

শ্রীকান্ত মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করলেন, কেউ দুধ জ্বাল দিচ্ছে, কেউ ক্ষীর তৈরি করছে, কেউ নাড়ু পাকাচ্ছে, কেউ ময়দা মাখছে, কেউ ফলমূল বানাচ্ছে। এক অল্প বয়সের বৈষ্ণবী একমনে ফুলের মালা গাঁথছে, আর তার সামনে বসে আর একজন নানা রঙে ছোপানো ছোট ছোট বস্ত্র খন্ড সযত্নে কুঞ্চিত করে গুছিয়ে তুলছে— এই সমস্ত কিছুই শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ আগামীকাল স্নানের পরে পরিধান করবেন। আখড়া জুড়ে রয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি বৈষ্ণব - বৈষ্ণবীদের এমনই আগ্রহ এবং একাগ্রতার ছবি। আখড়ার ঠাকুরঘরে কালো পাথর ও পিতলের রাধাকৃষ্ণের অনেকগুলি যুগলমূর্তির দর্শনে শ্রীকান্তের সাথে সাথে কৃষ্ণভক্ত পাঠকরাও হয়তো ভক্তি ভরে প্রণাম করে নেবেন। নবীন শ্রীকান্তকে জানিয়েছিল, মুরারিপুরের আখড়ায় বকুলতলায় বৃন্দাবনলীলা চলে, সেখানে একপাল বোষ্টমী আছে এবং সকলের সেরা বোষ্টমী কমললতা। সেরা হলেও কমললতা নিরহংকারী-ঈশ্বর সেবায় নিয়োজিত প্রাণ। তাই কমললতা মঠের কর্ত্রী নাকি শ্রীকান্তর এমন প্রশ্নে কমললতা জিভ কেটে উত্তর দিয়েছিল—

> "আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী - কেউ ছোট বড় নেই।"[১০]

এই মন্তব্যে রয়েছে গভীর বৈষ্ণব রসতত্ত্বগত ভাব-ব্যঞ্জনা। এমন মানসিকতায় উঠে আসে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের দাস্যভাব। যেখানে প্রভু বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্ত নিজেকে একজন দাস বা সেবক মনে করে। এই ভাবধারায় ভক্ত সম্পূর্ণভাবে ভগবানের প্রতি সমর্পিত থাকে। তাই মুরারিপুর আখড়ার সকল বৈষ্ণব - বৈষ্ণবী গোবিন্দজীর দাস দাসী।

বৈষ্ণবী কমললতা কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তাদের পাঁচ বাড়িতে ভিক্ষে করতে হয়। বৈষ্ণবদের এই ভিক্ষাবৃত্তিকে মাধুকরী ভিক্ষাবৃত্তি বলা হয়। মাধুকরী শব্দটি 'মধুকর' শব্দ থেকে এসেছে। মধুকর বা মৌমাছিরা যেমন বিভিন্ন ফুল থেকে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 120 - 128
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অল্প অল্প করে মধু সংগ্রহ করে আনন্দে জীবন কাটায়, ঠিক তেমনি গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা মুষ্ঠিভিক্ষা করে জীবন চালায়। ভিক্ষাবৃত্তি বৈষ্ণব জীবন-আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, বৈষ্ণব কবি সনাতন গোস্বামীর প্রশস্তিমূলক একটি পদ–

"ব্রজপুরে ঘরে ঘরে/মাধুকরী ভিক্ষা করে/ এইরূপে কথো দিন থাকে।।"[১১]

আলোচ্য পদের বিষয় হল - মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর কাছে যাবার নির্দেশ দিলেন। বৃন্দাবনে এই দুই ভাই গৌরাঙ্গের গুণ স্মরণ করে, বৈষ্ণব ধর্মের কঠোর কৃচ্ছসাধনের জীবন বরণ করেছিলেন। তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে ভিক্ষাবৃত্তি।

এইভাবে কমললতার সাথে প্রথম পরিচয় ও কথোপকথনের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্ম, জীবন-আচরণ, ভজন-সাধন সম্পর্কে শ্রীকান্ত এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। একসময় তাঁর মনে কমললতার মুখাবয়বের সৌন্দর্য সম্পর্কে মুগ্ধতা জাগে এবং কমললতার প্রকৃত পরিচয় জানতে চেয়ে বলেন–

"কমললতা তোমার বাড়ি কোথায়?"[১২]

তখনকার মতো কমললতা প্রশ্ন এড়িয়ে কীর্তন গানের মাধ্যমে শ্রীকান্তের মন ও চেতনাকে নিয়ে গেলেন এক আধ্যাত্মিক জগতে। সেখানে শ্রীকান্ত মানসিক শান্তি ও আশ্রয় লাভ করলেন বলে আপাতভাবে পাঠকবৃন্দ মনে করলেন। 'নতুন গোঁসাই' নাম নিয়ে শুরু হল শ্রীকান্তের এক নতুন অধ্যায়। কমললতার বৈষ্ণবীয় ব্যক্তিসত্তা, স্বতন্ত্র নারীসত্তা, শান্ত-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব সর্বোপরি মধুর কীর্তন কণ্ঠ - শ্রীকান্তকে আকৃষ্ট করে ফেলে। মন্দিরা সহযোগে সুস্পষ্ট ও মধুর কীর্তন গান শ্রবণে শ্রীকান্ত মোহিত হন–

"মদন-গোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল কি, যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি, নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী-লাল কি, গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ-গোপাল কি,"[১৩]

-এই সহজ ও সাধারণ গুটি কয়েক কথার আলোড়নে, ভক্তদের গভীর বক্ষস্থল মন্থিত করে পরম সুধা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের প্রতি এমন প্রেমময় ভক্তিগীতি সকল বৈষ্ণবদেরই অশ্রুসিক্ত করে। পাঠক মনকেও বিগলিত করে। এই পদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধা ও প্রেম নিবেদনের একটি চিরায়ত রূপ। প্রতিদিন সকালে কমললতার কণ্ঠে মঙ্গল আরতি সূচক একটি কীর্তন গান, সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়–

"কানু গলে বনমালা বিরাজে/ রাই গলে মোতি সাজে/ অরুণিত চরণে মঞ্জীর-রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে।"[১৪]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গলায় বনফুলের মালা শোভা পায় আর শ্রীরাধার গলায় মুক্তোর মালা সজ্জিত থাকে। এই পদে রাধা-কৃষ্ণের যুগল রূপের মাধুর্য এবং তাদের অলংকারের বর্ণনা করা হয়েছে। যা বৈষ্ণব সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাধা কৃষ্ণের অঙ্গসজ্জা থেকে চরণ সেবা বৈষ্ণব সংস্কৃতির মূল ধর্ম। এই সেবাধর্মে অহরহ ব্যপ্ত থাকাই কমললতার কাছে প্রভুভক্তির সমতুল্য।

উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে কাহিনির প্রয়োজনে আমরা জানবো কমললতার পূর্ব ইতিহাস। যা বর্তমান কমললতার বৈষ্ণবী হয়ে ওঠার পটভূমি স্বরূপ। মূল পালাকীর্তনের আগে যেমন গৌরচন্দ্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি লেখকও কমললতার কলঙ্কিত অধ্যায়ের পাতা উন্মোচনের পূর্বেই শ্রীকান্তের প্রতি কমললতার সুপ্ত প্রণয় বাসনা প্রকাশ করলেন। যাতে পাঠকের এমনটি মনে না হয় যে, কোনো নারী নিজের কলঙ্কের কথা কীভাবে পরপুরুষের কাছে নিজের মুখে ব্যক্ত করতে পারে! শ্রীকান্তের প্রতি কমললতা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রণয় নিবেদন করলেন–

"তবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কান্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে!"[১৫]

বৈষ্ণবীর প্রেম নিবেদনে, আবেদনে, অশ্রু মোচনে ও মাধুর্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে-শ্রীকান্তের হতবুদ্ধি মন কেবল লজ্জাতেই কন্টকিত হল না বরং একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত শান্তি, স্বস্তি অন্তর্হিত হল। তাঁর মনে হল যৌবন অতিক্রান্ত

জীবনে এ কোন্ অযাচিত নারী-প্রেমের বন্যা নেমে এল! কোথায় পালিয়ে সে আত্মরক্ষা করবে! শ্রীকান্তের এই লজ্জা, আশঙ্কা আর আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চণ্ডীদাসের রাধার আত্মার আকুতির সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে—

> "গোকুল নগরী মাঝে এতেক রমণী আছে/ তাহে কেন পড়িল না বাঁধা/ নির্মল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি/ বাঁশি কেন ডাকে রাধা রাধা।"[১৬]

প্রেম নিবেদনের এই অকপট স্বীকারোক্তির পরেই কমললতা তাঁর 'নতুন গোঁসাই'য়ের সামনে ভয়ঙ্কর অতীত অশ্রুজলে বর্ণনা করেন। কমললতার আসল নাম ঊষাঙ্গিনী, বাড়ি শ্রীহট্টে। বাবার ব্যবসা সূত্রে কমললতা কলকাতায় মানুষ। তাঁর মা দেশের বাড়িতে দুই ভাই সমেত সংসার নিয়ে থাকেন। কমললতার বিয়ে হয় 'শ্রীকান্ত' নামে এক পাত্রের সাথে কলকাতাতেই এবং সতেরো বছর বয়সেই তিনি বিধবা হন। এরপর একুশ বছর বয়সে কমললতার বাড়ির সরকার মন্মথের সাথে গোপন প্রণয় সম্পর্কের জেরে কমললতা সন্তান সম্ভাবনা হন। মন্মথের এক পিতৃহীন ভাইপো যতীন তাঁদের বাসাতেই থাকতো। বয়সে কমলের চেয়ে সামান্য ছোট ছিল। কমলকে 'দিদি' বলে ডাকতো, আর অসম্ভব ভালোবাসতো। কমলের বাবা যতীনকে কলেজে পড়াতেন। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে কমললতা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন এবং যতীনকে এক টাকার বিষ কিনে এনে দিয়ে সাহায্য করতে বলেন। মরার মতো ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে যতীন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে জানায়—

> "ঊষাদিদি আত্মহত্যার মতো মহাপাপ আর নেই। এছাড়া তুমি আর যা আদেশ করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন করব।"[১৭]

তাই ঊষাদির মরা হল না। শান্ত নিরীহ প্রকৃতির, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কমলের পিতা বিষয়টি জেনে দুঃখে লজ্জায় তিন দিন শয্যাশায়ী হলেন, তারপরে গুরুদেবের পরামর্শে নবদ্বীপে কমললতা ও মন্মথের বৈষ্ণব দীক্ষা সম্পন্ন হল। ঠাকুরের প্রসাদী মালা আর কণ্ঠী বদলের মাধ্যমে তাদের বিয়েও হবে ঠিক হল। ঊষাঙ্গিনীর নতুন নামকরণ হল 'কমললতা'।

এখনো পর্যন্ত তো কাহিনি সরলরেখাতেই চলছিল কিন্তু পরবর্তী ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক এবং হৃদয়স্পর্শী। মন্মথ আসলে অর্থ-পিশাচ, চতুর লোক, যে ঊষাঙ্গিনীর দেহটা চেয়েছিল-ভালবাসেনি। তাই প্রথমে কমলের পিতার কাছ থেকে বিয়ের জন্য দশ হাজার টাকা নেয়, পরে বিয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে আরো দশ হাজার টাকার দাবি করে। কমললতা এসব কিছুই জানতেন না, অবশেষে শুভদিনে কমললতা দাসীর মুখ থেকে যা শুনলেন তার সারমর্ম হল - মন্মথের ব্যাখ্যা অনুসারে কমললতার এই সর্বনাশের জন্য দায়ী যতীন। তাই মন্মথ ও কমললতার পিতা পাঠরত যতীনকে ঘর থেকে ডেকে দোষারোপ করেন, অপমান করেন। বাপ-মা মরা ছেলের অকৃতজ্ঞতাকে তুলে ধরেন। যতীন শুধু জানতে চেয়েছিল - এই মিথ্যাকে বলেছে! মন্মথ গর্জন করে বলে - ঊষা নিজের মুখে বলে। তাতে ঊষার বাবাও সায় দেন। নিরুপায় যতীন যে কিনা ঊষাদিদি ও তাঁর পিতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করে, সে বিনা প্রতিবাদে স্তব্ধ হয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল। তারপরের দিন সবাই দেখলো ভাঙা আস্তাবলের এককোণে যতীনের মৃতদেহ ঝুলছে। আত্মহত্যার নামে বড় পাপের ভয় পাওয়া পবিত্র যতীন, আত্মহত্যা দিয়েই দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। সেদিন কমললতা ঠাকুরের প্রসাদী মালা পাদপদ্মে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন। মন্মথের অশৌচ গেলেও পাপিষ্ঠা ঊষার অশৌচ ইহজীবনে আর ঘুচলো না। তারপর কমললতা নবদ্বীপে মৃত সন্তান প্রসব করে, তাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে, সমাজ সংসারের মোহ ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়েন। মুরারিপুরের আখড়ায় এসে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। প্রেমের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও তিক্ততা থেকে বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশের এই হল কমললতার ইতিবৃত্ত।

অধ্যাত্ম জীবনে কমললতার সাধন-জীবনের পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। এই সাধনার জগতে কমললতা তাঁর বেদনাভরা অতীত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকেন বলে আমাদের মনে হয়। কারণ যে কমললতাকে আমরা রসিকতাপ্রিয় সদা-হাস্যময়ী রূপে দেখতে পাই, গোবিন্দজীর সেবার সময় তাঁর আত্মহারা প্রাণ আর আচরণের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা দেখতে পাই না। তাঁর কীর্তনের কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষস্থল মন্থিত হয়ে অশ্রুজলে চক্ষু প্লাবিত হয়। আসলে সংসারে পাপ জিনিসটা বড় ভয়ঙ্কর - সেখান থেকে বর্তমানে কমললতার উত্তরণ ঘটলেও, প্রচন্ড মানসিক জ্বালায় প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অনুতাপে দগ্ধ হতে হয় তাঁকে।

মুরারিপুরের আখড়ায় শ্রীকান্ত হাতেগোনা দশটা দিন ছিলেন কিন্তু শ্রীকান্ত আখড়ায় প্রবেশের পূর্বেই শুধু নাম শ্রবণেই শ্রীরাধার পূর্বরাগের মতো, কমলের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। আখড়ায় প্রবেশমাত্র শ্রীকান্তকে গ্রহণ, সেবা, প্রণয় নিবেদন, পূর্ব ইতিহাস কথন, একসাথে ফুল তোলা, গোবিন্দজীর সেবা করা, অনুরাগ-মান-অভিমানের পর্ব চলা এবং অবশেষে শ্রীকান্তের আখড়া ত্যাগে দুটি নিঃসঙ্গ মনের সহাবস্থান-এরই নাম ভালবাসা। তবে তা দেহজ নয় বরং মানসিক, কিছুটা আধ্যাত্মিকও বটে। দুটি নিঃসঙ্গ বৈরাগী মনের বৈরাগ্য, প্রেমকে এমন এক রূপ দান করলে, যা দুজনের কাছেই কাঙ্খিত ছিল। কমললতার কথাবার্তা ও চিন্তায় বৈষ্ণব কবি চন্ডীদাসের জীবন দর্শন ফুটে উঠেছে—

> “কহে চন্ডীদাস শুনো বিনোদিনী সুখ-দুখ দুটি ভাই,/ সুখের লাগিয়ে যে করে পিরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই।”[১৮]

শ্রীকান্তের মনে এই সংগীত শ্রবণের প্রবল ইচ্ছা কমললতার মধ্যে রাধার মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলেছে। আবার কমললতার কণ্ঠে অপরূপ বৈষ্ণবীয় সঙ্গীত শ্রবণে, শ্রীকান্তের অসম্পূর্ণ, অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভেঙে যায়—

> "রাই জাগো, রাই জাগো, শুক-শারী বলে/ কত নিদ্রা যাওলো কালো মানিকের কোলে।”[১৯]

এই গানটি শ্রীকান্তের সাথে সাথে পাঠক বর্গেরও নিদ্রাহরণ করে। এইভাবেই কমললতার মধ্যে রাধাতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

এবার গহর গোঁসাইয়ের সাথে কমলের সম্পর্কের মূল্যায়নের চেষ্টা না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। কারণ গহরের কারণে নবদ্বীপের গুরুদেব এবং অন্যান্য গোঁসাইগণ কমললতার প্রকৃত বৈষ্ণব সত্তাকে অস্বীকার করেছেন। এই গহর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও হিন্দু বৈষ্ণব আখড়ায় যাতায়াত করতেন। তিনি গায়ক, কবি এবং সাধক। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে ভক্তিমূলক গান লিখতেন। আখড়ায় গহরের সাথে কমললতার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। গহর প্রেমপূজারিনী কমললতাকে, নীরব দর্শনের মধ্যে দিয়ে প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু প্রেমিক হিসাবে তার কোনো দাবি ছিল না। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের একটি চরণ—

> “হিয়া আমার পেতে রেখে/ সারাটা পথ দিলেম ঢেকে/ আমার ব্যথায় পড়ুক তাহার চরণখানি।”[২০]

কমললতাও গহরকে ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসায় কামনা বাসনা ছিল না। এই ভালোবাসার সম্পর্কের মূল্যায়ন করেছেন স্বয়ং শ্রীকান্ত। অসুস্থ গহরকে টানা তিনদিন সেবা করে, সমস্ত আসা যাওয়া শেষ করে, যখন কমললতা আখড়ায় ফিরলেন, তখন বড় গোঁসাইজীর গুরুদেব ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা কমললতাকে ‘অশুচি’ আখ্যা দিয়ে জানালেন - তাঁর সেবায় ঠাকুর কলুষিত হবেন। তাই ঠাকুর ঘরে তার যাওয়া বারণ। কিন্তু শ্রীকান্ত দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন—

> “এত বড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয় মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যু - পথযাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।”[২১]

চন্ডীদাসের রাধা যে শুধু সুখ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছেন তা নয়, প্রেম পিরিতির দুঃখময় সমুদ্রেও হাসিমুখে অবগাহন করেছেন। তাতে যদি প্রাণ বিসর্জিত হয় তাও তা বরণযোগ্য। লোকচক্ষুকে উপেক্ষা করে চন্ডীদাসের রাধার, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সমর্পিত চিত্ত, সেই একই পথের পথিক কমললতা। শ্রীকান্ত কমলের কাছে হয়ে উঠেছিলেন রক্তমাংসে গড়া শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। তাইতো পুজোর ফুল স্থলপদ্ম তোলার সময় কমললতা বলেছিলেন—

> “না, ও আমরা তুলিনে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই।”[২২]

ওই ঠাকুর আসলে স্বয়ং শ্রীকান্তই। মনোযোগী পাঠকের কাছে এ নিশ্চয়ই উপলব্ধির বাইরে নয়। যে প্রেমকে কাছে পাওয়ার জন্য রাজলক্ষী সদা সর্বদা শঙ্কিত থেকেছেন, যে উন্মাদনা রাজলক্ষীকে মুরারিপুরের আখড়া পর্যন্ত টেনে এনেছিল, সেই প্রেমকেই কমললতা নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করে দিতে পেরেছেন। আসলে, এই উদার ও মুক্ত চেতনাই বৈষ্ণবীয় জীবন সাধনার অঙ্গ। শরৎচন্দ্র সারা জীবন বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলীর প্রতি প্রবল অনুরাগী ছিলেন বলেই, এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে কমললতা চরিত্রটিকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চতুর্থ পর্বের এই কমললতাই বাকি তিন পর্বের সর্বপ্রধানা ও চির - আকাঙ্ক্ষিতা নারী চরিত্র। কমললতার দৈহিক ও চারিত্রিক গঠনে প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব ধর্মবাদ। বাঙালির শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পদাবলী কীর্তনে কি অপরিসীম ভাবাবেগ ও অন্তহীন আকুতি রয়েছে, কমললতার উপাখ্যান, পাঠকবর্গকে আরো একবার স্মরণ করায়।

> "বৈষ্ণব রস ছানিয়া যেন কমললতার মূর্তিটি নির্মাণ করা হইয়াছে। গোপীপ্রধানা রাধিকার মতোই কমললতার কিছুটা ব্যক্ত, কিছুটা অব্যক্ত, কিছুটা মানবিক, কিছুটা যেন আধ্যাত্মিক। রাধার মতো সেও তো কলঙ্কিনী। রাধা বলিয়াছিলেন, 'কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ', - কমললতাও তাহার সকল কলঙ্কের ডালি কৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। দিবারাত্র রসের চর্চা করিতে করিতে তাহার সমগ্র সত্তাটি যেন রসে স্নাত হইয়া আছে।"[২৩]

কমললতা শরৎচন্দ্রের মানস-লোকের সৃষ্টি। তার সাথে বাস্তবের চরিত্রের কোনো মিল নেই। শরৎচন্দ্রের কমললতা যেন বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের শ্রীরাধা। জীবনের উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া তার জীবনকে প্রভাবিত করে না। কমললতার কাহিনি বৈষ্ণব কবিদের সাধন-সংগীত। কৃষ্ণপ্রেমে উৎসর্গীকৃত তার প্রাণ। জাতি, ধর্ম, বর্ণের ঘেরাটোপ তার কাছে তুচ্ছ। তার প্রেম শুধুই ইষ্টদেবতার আরাধনা। সেখানে শ্রীকান্ত উপলক্ষ মাত্র। কমললতার কাছে শ্রীকান্ত তাই বৃন্দাবনের সেই চির-পরিচিত সখা। শ্রীকান্তের সাথে প্রথম সাক্ষাতে কমললতার এই পূর্ব-পরিচিতিমূলক কথাবার্তা পাঠক ঠাট্টাই মনে করবেন নিশ্চিত। কিন্তু বৈষ্ণবপন্থী শরৎচন্দ্রের ভগবদ্বিশ্বাসী চোখ দিয়ে কমললতার মনের গহনে অবগাহন করলে ভাবলোকে কিছুটা সত্য উপলব্ধি করা যায়। কারণ শরৎ-শিল্পীর নিপুণ তুলিতে, কমললতা চরিত্রে অঙ্কিত হয়েছে বৈষ্ণব ধর্মবাদ। তাইতো কাহিনির শেষে বৈষ্ণবী কমললতা, মুরারিপুরের বৈষ্ণব আখড়া ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশির আহ্বানে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। কমললতার অতীত - যা সমাজের চোখে কলঙ্কিত অধ্যায় তা বৈষ্ণবী জীবনের কৃচ্ছ্র-সাধনায় ধুয়ে মুছে সাফ্ হয়ে গেছে। পাঠক মনেও ম্লান হয়ে গেছে। শ্রীকান্তের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম আর মৃত্যু-পথযাত্রী গহরের প্রতি দ্বিধাহীন ঐকান্তিক সেবা, কমললতাকে বৈষ্ণবীয় সত্তায় উত্তীর্ণ করেছে। শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের কাছে কমললতার "জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবি চিত্তের অশ্রুজলের গান।"[২৪]

পরিশেষে, উল্লেখ করি, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব অবলম্বনে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের আধারে কমললতার উপাখ্যান নিয়ে হরিসাধন দাশগুপ্তের পরিচালনায় একটি বিখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল, যার নাম 'কমললতা'। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন - উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, তরুণ কুমার, পাহাড়ি সান্যাল প্রমুখেরা। বৈষ্ণব সমাজের ঊর্ধ্বে আজও এই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার আবেদন বাঙালি সমাজে সমানভাবে বিদ্যমান। বঙ্গসমাজ ও বাংলা সাহিত্যে বহু চর্চিত বৈষ্ণব ধর্ম, তত্ত্বদর্শন, শরৎ উপন্যাসে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়ে, এইভাবেই আধুনিক সমাজ ও নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, এক অভিনব শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়েছে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথী, 'শরৎ কথা', (১ম খণ্ড), প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ - নভেম্বর, ২০২১, পৃ. ১৬

২. রায়, গোপালচন্দ্র, 'শরৎচন্দ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, ৯, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুলাই, ২০২৩, পৃ. ৩৫

৩. ঘোষ, অজিত কুমার, 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার', প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ - অগ্রহায়ণ, ১৪১৪, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৮৬

৪. তদেব, পৃ. ৮৫

৫. তদেব, পৃ. ৮৬

৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'শরৎ রচনাবলী' (প্রথম খন্ড), প্রকাশক - কল্যাণ ব্রত দত্ত, তুলি-কলম, ১ কলেজ রো, কলকাতা -৯, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ৬৪৯

৭. তদেব, পৃ. ৬৫১

৮. তদেব, পৃ. ৬৫১

৯. তদেব, পৃ. ৬৫২
১০. তদেব, পৃ. ৬৫৩
১১. গিরি, সত্য, 'বৈষ্ণব পদাবলী', প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২, পৃ. ৩৩৩
১২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'শরৎ রচনাবলী' (প্রথম খন্ড), প্রকাশক - কল্যাণব্রত দত্ত, তুলি-কলম, ১ কলেজ রো, কলকাতা -৯, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ৬৫৪
১৩. তদেব, পৃ. ৬৫৫
১৪. তদেব, পৃ. ৬৫৭
১৫. তদেব, পৃ. ৬৬২
১৬. মজুমদার, মোহিতলাল, 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কুলগাছিয়া, হাওড়া, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৯
১৭. তদেব, পৃ. ৬৬৫
১৮. তদেব, পৃ. ৬৭২
১৯. তদেব, পৃ. ৬৭০
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সঞ্চিয়িতা', প্রকাশক - কল্যাণব্রত দত্ত, তুলি-কলম, ১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ: মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৬৬৬
২১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'শরৎ রচনাবলী' (প্রথম খন্ড), প্রকাশক - কল্যাণব্রত দত্ত, তুলি-কলম, ১ কলেজ রো, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ৭২৬
২২. তদেব, পৃ. ৬৭৪
২৩. ঘোষ, অজিত কুমার, 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার', প্রকাশক, সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ - অগ্রহায়ণ, ১৪১৪, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২৮০
২৪. তদেব, পৃ. ২৮০